দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... MAY 1 1 1999
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৪

493

মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এক অপর থেকে অবিচ্ছেদ্য। বিশ্বের অন্য কোন দেশে কোন কালে কোন একটি প্রতিষ্ঠান এককভাবে দেশের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য এমন অবদান রেখেছে বলে আমাদের জানা নেই। কি সেই অবদান? আমরা যারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সমাজের সচেতন ব্যক্তি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখেছি ১৯৪৮-এ, '৫২-তে, '৬২, '৬৬ এবং '৬৯-এ আমরা হয়তো জানি কি ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্যে, কি দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গণতন্ত্র ও নব উন্মোষিত বাঙালি চেতনা, বাঙালিত্ববোধের পরিচর্যা করতে হয়েছে, নবজাতক শিশুর মতো লালন করতে হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই দুই মূল্যবোধ ও চেতনার পরিপুষ্টি সাধন করতে হয়েছে। কতো শিক্ষককে নিগৃহীত হতে হয়েছে, কতো শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগ এবং দুই ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্র নেতা- নেত্রী-কর্মীদের নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, জীবনের অনেক সম্ভাবনাকে নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হয়েছে সংগ্রাম-আন্দোলনের পথে। কতো ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। আমরা পুরাতন প্রজন্মের যারা তারা সবই দেখেছি, সবই জানি, সবই আমাদের মনের মণিকোঠায় রয়েছে জীবনের এক পরম সম্পদ হিসেবে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম, '৭১ পরবর্তী প্রজন্ম? তারা তো বঞ্চিত, তারা তো দেখেনি, জানে না। তাই নতুন করে আবারো বলছি মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা। বলার প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভব করি, যখন দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির অপছায়া পড়ছে, যা আমরা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছি না, বুঝে উঠতে পারলেও এক ধরনের উদাসীনতায় ভুগছি এবং সে অপছায়াকে প্রসারিত প্রলম্বিত হতে নিজেদের অজান্তে সাহায্য করছি। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থে নিজেদের মধ্যে বিভাজন ডেকে এনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি প্রসারে সহায়তা করছি।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করবো। এখন চলুন ফিরে যাই ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে অর্থাৎ সাতচল্লিশ-পূর্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার সঙ্গে তুলনা করি সাতচল্লিশ-পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এমন পরিবর্তন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন বললেও ভুল বলা হবে না। এদেশের সমাজ, সরকার, কোন প্রতিষ্ঠান, কিংবা পরিমন্ডলে দেখা যায়নি। চল্লিশ দশকে প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পেয়েছি, দেখেছি শিক্ষার্থী হিসেবে। তখন 'কমিউন্যাল পলিটিক্স' সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সারা ভারতকে উত্তাল করে তুলেছে- একদিকে মুসলিম লীগ, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা- এই দুয়ের মধ্যিখানে কংগ্রেস তার অসাম্প্রদায়িক, অখন্ড ভারতীয় চরিত্র এবং সেক্যুলার ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে সামনে রাখতে পারছে না। এই 'কমিউন্যাল পলিটিক্সের' ঢেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এসে লেগেছিল। তখন চারটি মাত্র ছাত্রাবাস (Hall) ছিল- মুসলমান ছাত্রদের জন্য সলিমুল্লা মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) হিন্দু ছাত্রদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মুসলমান ছাত্রছাত্রীই প্রথমোক্ত দুই হলের আবাসিক (Residential) এবং অনাবাসিক (Attached) ছাত্রছাত্রী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল; হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা অনুরূপভাবে অন্য দুই হলের ছাত্রছাত্রী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। 'কমিউন্যাল পলিটিকসের' ঢেউ যখন এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগলো তখন এই বিভাজন এমন প্রকট হয়ে উঠেছিল আমাদের ধ্যান-ধারণায়, আচরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আমরা চার হলে ছাত্রছাত্রী তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেন ভুলে গিয়েছিলাম আমরা একই শহরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, একই 'আলমা মেটার' (Alma mater)-এর। আমার যতদূর মনে পড়ছে, আন্তঃহল ফুটবল প্রতিযোগিতায় কিংবা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হলকে হারিয়ে যতটুকু উল্লাস প্রকাশ করতো তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি উল্লাস দেখাতো ঢাকা কিংবা জগন্নাথ হলকে হারিয়ে। অনুরূপভাবে জগন্নাথ বা ঢাকা হল উল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিতো যে কোন একটি মুসলিম হলকে হারাতে পারলে। কিন্তু হিন্দু দুই হলের মধ্যে খেলায় বা বিতর্কে হারজিতে এতো উল্লাস-উদ্দীপনা দেখা যেতো না। ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ত্রিশ দশকে এই সাম্প্রদায়িকতার সংক্রমণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়নি। কিন্তু চল্লিশ দশকে এসে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে পাই। এর কারণ যে সারা ভারতে 'কমিউন্যাল পলিটিক্সের' জোয়ার তা আগেই বলেছি। এই জোয়ারের ফলে কার্জন হলে ছাত্রীদের এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়, ১৯৪৩-এর জানুয়ারিতে। ২রা ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে) আবার সংঘর্ষ হয় এবং মুসলিম ছাত্রনেতা নজির আহমদ ছুরিকাহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই কলংকজনক অধ্যায় এখানে তুলে ধরলাম শুধু এটুকু বুঝবার জন্য যে, বৃহত্তর কমিউন্যাল পলিটিক্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারাকে কি বীভৎস করে তুলেছিল। আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল 'আলমা মেটার'কে, যার মূল মন্ত্র ছিল 'ট্রুথ শ্যাল প্রিভেল'। সবচেয়ে বড় কথা সেদিনের সেই তরুণ মনগুলোকে সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে এমন ভরে দিয়েছিল যে, আমরা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জগন্নাথ হল, ঢাকা হলের ছাত্র হলেও, ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান বা হিন্দু হলেও আমরা বাঙালি তা ভুলে গিয়েছিলাম। যে বাঙালিত্বকে আমরা পাল, সেন, সুলতানী বা মোঘল আমলের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও আমাদের চৈতন্যের গভীরে লালন করে এসেছি হাজার বছর ধরে তা যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

এতো গেল সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য এক বছর পরই আটচল্লিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে এসে দেখলাম সম্পূর্ণ নতুন এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যেন চেনাই যায় না বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে অস্থায়ী নিযুক্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। ক্লাস নিয়ে বিকেলে সলিমুল্লাহ হলের দিকে যাচ্ছি। জগন্নাথ হলের মিলনায়তন তখন প্রাদেশিক আইনসভার 'এসেম্বলী হাউজ'। তার সামনে ছাত্র-বিক্ষোভ চলছে, শ্লোগান 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। মনে হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন এক বাঙালিত্বের জন্ম চিৎকার (Birth Cry) শুনতে পাচ্ছি। সত্যিই তা-ই ছিলো। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ নতুন করে জন্ম নিলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই জন্ম নিয়েছিলো। শুধু জন্ম নয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার, বাঙালির স্বায়ত্তশাসন অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ও মুক্তি- এক কথায়, বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জনে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি-আন্দোলন-সংগ্রাম, সবকিছুরই লালন-পালন-পরিচর্যা পরিপুষ্টি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ আগেই বলেছি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা তার প্রধান ধারক এবং বাহক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহান ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না। এই ভূমিকা আজ সর্বমহলে, দলমত নির্বিশেষে স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে যে কথাটি বলতে চাইছি তা হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জন্য একটি বড় শক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকবে, রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকবে এবং তা থাকা গণতন্ত্রের জন্য বাঞ্ছনীয়, তবে তা থাকবে সহাবস্থান এবং সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে। বাইরের বৃহত্তর সমাজে রাজনৈতিক মতবিরোধ স্বাভাবিকভাবেই থাকবে এবং আছে। আমাদের আবেদন, ছাত্রদের আন্দোলন, শিক্ষকদের রাজনীতি এবং বৃহত্তর কেন্দ্রের রাজনীতি যেন দীর্ঘকালের ত্যাগ-তিতিক্ষা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় শক্তি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তাতে যেন আঘাত না লাগে, তা যেন ক্ষুণ্ন না হয়, তাতে বিভাজন আনার কোন অপপ্রয়াস যেন না হয়। এদেশে মুক্তযুদ্ধের স্মারক হিসেবে যথাযথভাবেই প্রথম ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এর পরিচালনায় কোনক্রমেই যেন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী কোন প্রভাব না পড়ে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।